দুঃখ বলে রইনু চুপে

[গল্প]

মধুপর্ণা নাথ

কলকাতায় নামার পরই প্রথমে যা ঘটল তা হলো এয়ারপোর্টে আমার হাত থেকে পড়ে দামী ঘড়িটা ভেঙে যাওয়া। আর সেই ঘড়িটা ঠিক করানোর তাগিদেই কলেজ স্ট্রীটের বৃটিশ আমলের পুরোনো ঘড়ি-সারাইয়ের দোকানটাতে ঢুকলাম আর দেখতে পেলাম 'তাকে'; প্রায় ১১ বছর পর।

আজ ১১ই নভেম্বর ২০১১, ইউরোপীয় মতে ১১/১১/২০১১ অনেক শুভ সংখ্যা তাই আজ একটা সৌভাগ্যের দিন বলা যেতে পারে, কিন্তু নিজের প্রাক্তন প্রেমিকাকে নিজের পাশে দাঁড়ানো দেখতে পাওয়া কি ঠিক সৌভাগ্যের পর্যায়ে পড়ে? তা ঠিক জানি না।

আমি তার সাথে কথা বলতে যথেষ্ট ইতস্ততবোধ করছিলাম। এক ঝলকের জন্য চোখের কোণ দিয়ে সন্তর্পণে তার মুখাবয়বটা আলতো দেখেই আবার ভাঙা ঘড়ির দিকে নামিয়ে নিলাম চোখ। ঘড়ির দোকানে চারিদিকে ঘড়ি, সবদিকে চলছে ছুটন্ত সময় অথচ আমার মনে হলো সময়টা থেমে গেছে কিংবা শুধু থেমে থাকেনি ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে পিছের দিকে ।

''মিস্টার আর্টিস্টের এখনও 'জর্জিও আরমানি' ঘড়ির প্রতি খুব টান রয়ে গেছে বুঝি !''

অ্যাডিলেডের সেই পরিচিত গলার স্বর কানে আসতেই আমি অস্বস্তি আর অপরাধবোধ দুটোই বোধ করলাম তবে তা লুকিয়ে রেখে মৃদু হেসে জবাব দিলাম 'হাই লিডি,'

তার পুরোনো সাদা কার্ডিগানের নিচের ফ্যাকাশে বেগুনি রঙের পোশাকটা দেখে মন্তব্য করলাম, ''বেগুনি এখনও তোমার প্রিয় রং, তাই না ?''

সে মাথা নেড়ে হাসলো, ''তোমাকে বাদ দিয়ে আমার বাকি সব প্রিয় জিনিসগুলো এখনও একই রকম আছে, আমি এত তাড়াতাড়ি বদলাই না।''

কথাটা সে মজার ছলে বলেছে , আমি তাকে ছেড়ে চলে গেছি এই অনুযোগটি সে আনে নি, আনবার মতো মানুষও সে নয়, তবুও নিজের আচরণের জন্য ভেতরে ভেতরে অপরাধবোধ আমায় কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল।

আমি তাকে ঠকিয়েছিলাম; অন্য কোনো মেয়ের জন্য নয়, বরং ভালো জীবনের খোঁজে, ভালো দেশের খোঁজে। আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম অ্যাডিলেডকে, পাড়ি জমিয়েছিলেন ফ্রান্সে কারণ আর্টিস্ট হবার স্বপ্ন পূরণ করবার ছিলো আর ঘরকুনো দায়িত্বশীল মেয়েটা এখানে থেকে গিয়েছিল নিজের বাবা-মা আর নিজের ব্যর্থ আইনজীবীর ক্যারিয়ার আঁকড়ে ধরে।

এখন ফ্রান্সে আমার একটা সফল আর্ট স্টুডিও আছে, একাধিক নারীসঙ্গভরা জীবনও আছে, একজন অবিবাহিত পুরুষের থাকার জন্য যথেষ্ট বড় বাড়ি আছে। সবই যেন পর্যাপ্ত ছিলো, কিন্তু আজ ১১ বছর পর যখন সেই মেয়েটাকে দেখলাম;যাকে খোঁজার চেষ্টা আমি গত এক দশকের বেশি সময় ধরে করি নি, আমার কাছে আমার এই পূর্ণ জীবনটা বড়ো ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল।

সে আমার পুরোনো দোষ নিয়ে কিছু বলেনি তাই আমিও নিজের অপরাধবোধটা খানিক পাশে সরিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলাম,

''অ্যাডিলেড! পাঁচ মিনিট হাঁটবে একসাথে ?''

''হ্যাঁ, চলো , আমিও তো হেঁটেই যাচ্ছি সামনে ,আমার মেয়ের কাছে।''

মেয়ের কথা উল্লেখ করতেই উওর পেয়ে গেলাম আমার মনের মূল প্রশ্নের - ''সে বিয়ে করেছে কি না ।''
হাঁটতে হাঁটতে জানতে চাইলাম,
''তোমার মেয়ের বয়স কত?''
'পাঁচ', সে বলল। হিসেব কষে দেখলাম , আমি চলে যাওয়ার কিছু বছরের মধ্যেই সে সংসার বেঁধে ফেলেছে এমনকি মাও হয়ে গেছে ।

থাক, আমি নিজেও তো আর খুব সাধুপুরুষ নই, কত সম্পর্ক ভেঙেছি গড়েছি এই বছরগুলোতে।

কিন্তু তবুও শত সম্পর্কের জঞ্জালের মাঝেও আমার মনে আমাদের সেই জীবনের প্রথমবেলার প্রেমের স্মৃতিগুলো অক্ষত ভাবে সজ্জিত আছে, ঠিক যেন বইয়ের তাকে সামলে রাখা প্রিয় বইটার মতো। বেশ বুঝতে পারলাম ভেতরের এক কোণে শুধুমাত্র তাকে সাথে রাখার অপূর্ণ তৃষ্ণা এখনো আছে ।

আমাদের কথা হচ্ছিল অল্প স্বল্প; সে বর্তমানের কথা তুলছিল, আর আমি বারবার তুলছিলাম আমাদের অতীত। দুজন মানুষের মধ্যে কিছু ভেঙে গেলে, যে নির্দোষ তার পক্ষে দোষীর ভুল কে ক্ষমা করা অনেক সহজ, কিন্তু দোষীর পক্ষে নিজের ভুলকে ভুলে গিয়ে নিজেকে ক্ষমা করা অনেক কঠিন। আসলে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা বিবেকদংশনের বিষাক্ত জ্বালা তো আর নিস্পাপ হৃদয়কে ভোগ করতে হয় না!

''Sorry Liddy– for the past.''
কথার মাঝেই খাপছাড়া ভাবে বলে ফেললাম আমি, কারণ বুঝতে পারছিলাম তার হৃদয়ের গহীনে এখনো একটা অপ্রকাশিত যন্ত্রণা লুকিয়ে আছে।
''ঠিক আছে কবীর, সম্পর্ক ভাঙার জন্য সবসময় দুজনই দায়ী থাকে। হয়তো তুমিই বেশি দোষী ছিলে, কিন্তু দায় তো কিছু আমারও আছে ।'' সে বলল, তারপর রাস্তায় ছড়ানো ধূসর নুড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, ''তো এত বছর পর ভারতে আসার কারণ কী?''
''মা মারা গেছেন'', আমার কাঁপা কাঁপা কণ্ঠ থেকে কথাটা বেরোল। সে অবাক হলো শুনে এবং আমি জানি সে নিশ্চয় অনেক দুঃখও পেয়েছে কারণ আমার মা আর তার সম্পর্কটাতো বেশ আন্তরিক ছিল। মা-তো সবসময় চাইতেন যেন আমি অ্যাডিলেডকেই বিয়ে করি।
আসলে ধর্ম ও সংস্কৃতির ফারাক কিংবা হয়তো স্বয়ং ভাগ্যদেবতাও আমাদের আলাদা করতে পারতেন না, কিন্তু আলাদা হয়ে যাবার সিদ্ধান্তটা তো আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত ছিলো।
প্রায় সাত মিনিট হাঁটার পর সে বলল,
''এবার যেতে হবে, মেয়ে অপেক্ষা করছে।''
রাস্তার অপর পাশে একটা মিশনারী নার্সারি, ছোটো বাচ্চারা ছুটি শেষে দাঁড়িয়ে আছে - সম্ভবত সে সেখানেই যাবে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখলাম এখনো এয়ারপোর্ট থেকে কেনা কিছু চকলেট অযত্নে পড়ে আছে পকেটের তলদেশে
''এগুলো নিয়ে যাও । তোমার মিষ্টি মেয়েটার জন্য এই ইম্পোর্টেড চকলেট, এটা তো তোমারও প্রিয় ছিল একসময় !''
বলতে বলতে আমি তার ঠান্ডা হাতের তালু ঢেকে দিলাম খয়েরী রেফারে মোড়া এক গাদা চকলেট দিয়ে। সে কিছু বলল না, শুধু একটা নিষ্প্রাণ হাসি দিল।
''তোমার মেয়ের নাম কী?'' জিজ্ঞেস করলাম।
''লিনি ! আমি তাকে লিনি বলেই ডাকি। ভালো নামটা স্কুলের খাতায় পড়ে আছে, একটু সেকেলে নাম

হওয়ায় একটু বড় তাই ডাকা হয় না। আসলে তার Grandmother এর নামে রেখেছি ।”
“Granndmother মানে তোমার মা?”
“না, লিনির ঠাম্মার নামে, ওর বাবার মা।”

ধীরে ধীরে দেখলাম আডিলেড রাস্তা পার হয়ে গেল। আমি উল্টোদিকের ফুটপাথেই দাঁড়িয়ে রইলাম, জায়গাটা ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না অথবা দাঁড়িয়ে থেকে লিডর বর্তমান জীবন দেখার সাধ জাগছে। তাকিয়ে রইলাম সামনের রাস্তায় হেঁটে যাওয়া নারীটার দিকে।

কিন্তু আশ্চর্য লাগল যে সে নার্সারিতে ঢুকল না, বরং সে ঢুকে গেল মিশনারীর পাশে থাকা গির্জায় এবং কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি ধরলো, হয়তো রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকা আমাকে তার চোখে পড়ে নি।

আমি কোনকিছু না ভেবেই রাস্তা পার হলাম দাড়ালাম দ্বিতল সাদা গির্জার সামনে । ঢুকে দেখলাম প্রার্থনাস্থল পেরিয়ে গির্জার উঠোনের পিছন দিকেই রয়েছে একটা ছোট্ট কবরস্থান।

শান দেওয়া পাথরের ফলকগুলোর নীচে শায়িত অনেকগুলো কবরের মাঝেই চোখ গেলো জলপাইয়ের ছায়ার থাকা একটা ছোটো কবরের নিচে, কিছু সযত্নে রেখে যাওয়া সাদা গোলাপের সাথে আমার দেওয়া চকলেটগুলিও রাখা আছে সেই ছোট্ট কবরের ওপর। যেন কেউ আদর করে কবর টা পরিষ্কার করে জিনিসগুলো সাজিয়ে গেছে কবরটার উপর। এপিটাফের লেখা ডেট দেখে বুঝলাম, ওটা ছিল স্রেফ পাঁচ বছর বেঁচে থাকা এক বাচ্চার কবর;সে আবার মারা গেছে আজ থেকে আরোও পাঁচ বছর আগে। মৃত্যুর পর তো আর মানুষের বয়স বাড়ে না তাই মেয়েটা এখনো সেই পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়েটাই রয়ে গেছে , অথচ পাঁচ বছর ধরে সে এই শুয়ে আছে মাটির নীচের ঘরে , তার মানে দাঁড়ায় বাচ্চাটা জন্মেছিল প্রায় বছর দশেক আগে ! আমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ ছ্যাঁত করে উঠল, রিনরিনে ব্যথা শুরু হলো বা পাশে, আমার পা দুটো এই বড় দেহ সামলাবার শক্তি পেলো না, আমি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম কবরটার কাছেই।

ফিসফিস করে নিজে নিজেই বললাম, “অ্যাডিলেইডের মেয়ে?” বুঝলাম, সন্তান মারা গেলেও মায়ের ভেতরের মাতৃত্ব বুঝি সারাজীবন বেঁচে থাকে।

লক্ষ্য করলাম পাথরে খোদাই করা ইংলিশ হরফে লেখা আছে বাচ্চাটার নামের প্রথম অংশ; ‘মৃণালিনী’; যা আমার মায়ের নাম। সত্যিই তো, ছোট্টো সেই মেয়েটার ভালো নামটাতো ভালবেসে রাখা হয়েছিলো তার বাবার মায়ের নামে ।